

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১৭

সূরা আশ্বিয়া ৭৬-৮২

সূরা আল আশ্বিয়া কুরআনের একুশতম সূরা। এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর আয়াত সংখ্যা ১১২ টি। আশ্বিয়া শব্দের অর্থ নবীগণ।

নামকরণ

الْأَنْبِيَاءُ আশ্বিয়া শব্দটি নাবী শব্দের বহুবচন। এই সূরাতে একাধিক নাবী ও রাসুলের আলোচনা করা হয়েছে বিধায় একে সূরা আশ্বিয়া নামে নামকরণ করা হয়েছে।

সূরাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সে সম্পর্কে গাফেল, নাবীদের বৈশিষ্ট্য, পূর্ববর্তী কয়েকটি অবাধ্য জাতির ধ্বংস, একাধিক মা'বুদ থাকলে কী সমস্যা হত এবং যে ফেরেশতাদেরকে অনেকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা মনে করে তারা মূলত তা নয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর কয়েকজন নাবীর কাহিনী, তাদের আহ্বানে আল্লাহ তা'আলার সাড়া দান, ইবরাহীম (عليه السلام)-এর পিতা ও জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত, দাওয়াত পেয়ে তাদের অবস্থান এবং সবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে আসা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী উভয়ের দৃষ্টিতেই মনে হয় এর নাযিলের সময়-কাল ছিল মক্কী জীবনের মাঝামাঝি অর্থাৎ আমাদের বিভক্তিকরণের দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে। শেষ ভাগের সূরাগুলোর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এর পটভূমিতে তা ফুটে ওঠে না।

বিষয়বস্তু ও কেন্দ্রীয় আলোচ্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলছিল এ সূরায় তা আলোচিত হয়েছে। তারা নবী করীমের (সা) রিসালাতের দাবী এবং তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করতো তার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে তার মোকাবিলায় যেসব কৌশল অবলম্বন করা হতো সেগুলোর বিরুদ্ধে হুকমি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তাদের অশুভ ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা যে ধরনের গাফলতি ও ঔদ্ধত্যের মনোভাব নিয়ে তার দাওয়াতকে আগ্রহ্য করেছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের জন্য দুঃখ ও বিপদ মনে করছো তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

ভাষণের মধ্যে বিশেষভাবে যে সমস্ত আলোচিত হয়েছে সেগুলো নিচে দেয়া হলোঃ

একঃ মানুষ কখনো রসূল হতে পারে না, মক্কার কাফেরদের এ বিভ্রান্তি এবং এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল মেনে নিতে অস্বীকার করাকে-বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নিরসন ও খণ্ডন করা হয়েছে।

দুইঃ নবী করীমের (সা) ও কুরআনের বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ধরনের আপত্তি উত্থাপন করা এবং কোন একটি কথার ওপর অবিচল না থাকার-ওপর সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে পাকড়াও করা হয়েছে।

তিনঃ তাদের ধারণা ছিল, জীবন নেহাতই একটি খেলা, কিছুদিন খেলা করার পর তাকে এমনিই খতম হয়ে যেতে হবে, এর কোন ফল বা পরিণতি ভুগতে হবে না। কোন প্রকার হিসেব নিকেশ এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অবকাশ এখানে নেই।-যে ধরনের গাফলতি ও অবজ্ঞা সহকারে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের প্রত্যাখ্যান করছিল, ঐ ধারণাই যেহেতু তার মূল ছিল, তাই বড়ই হৃদয়গাহী পদ্ধতিতে এর প্রতিকার করা হয়েছে।

চারঃ শিরকের প্রতি তাদের অবিচল নিষ্ঠা এবং তাওহীদের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ছিল তাদের ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিরোধের মূল ভিত্তি।-এর সংশোধনের জন্য শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে সংক্ষিপ্ত কিন্তু মোক্ষম ও চিত্তাকর্ষক যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।

পাঁচঃ এ ভুল ধারণাও তাদের ছিল যে, নবীকে বারবার মিথ্যা বলা সত্ত্বেও যখন তাদের ওপর কোন আযাব আসে না তখন নিশ্চয়ই নবী মিথ্যুক এবং তিনি আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাবের ভয় দেখান তা নিছক অন্তসারশূন্য ছকমি ছাড়া আর কিছুই নয়।-একে যুক্তি ও উপদেশ উভয় পদ্ধতিতে দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর নবীগণের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থেকে কতিপয় নজির পেশ করা হয়েছে। এগুলো থেকে একথা অনুধাবন করানোই উদ্দেশ্য যে, মানবেতিহাসের বিভিন্ন যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব পয়গম্বর এসেছিলেন তারা সবাই ছিলেন মানুষ। নবুওয়াতের বিশিষ্ট গুণ বাদ দিলে অন্যান্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাঁরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের মতই মানুষ ছিলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের গুণাবলী এবং খোদায়ীর সামান্যতম গন্ধও তাদের মধ্যে ছিল না। বরং নিজেদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের জন্য তারা সবসময় আল্লাহর সামনে হাত পাততেন। এই সংগে একই ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দুটি কথাও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নবীদের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদ-আপদ এসেছে এবং তাদের বিরোধীরাও তাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত সকল নবী একই দীনের অনুসারী ছিলেন। এবং সেটি ছিল সেই দীন যেটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন। এটিই মানব সম্প্রদায়ের আসল ধর্ম। বাদবাকি যতগুলো ধর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো নিছক পথভ্রষ্ট মানুষদের বিভেদাত্মক প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সবশেষে বলা হয়েছে, এ দীনের অনুকরণ ও অনুসরণের ওপরই মানুষের নাজাত ও মুক্তি নির্ভরশীল। যারা এ দীন গ্রহণ করবে তারাই আল্লাহর শেষ আদালত থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে আসবে এবং তারাই হবে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী। আর যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা আখেরাতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পরিণতির সম্মুখীন হবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই আল্লাহ নিজের নবীর মাধ্যমে মানুষকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে চলছেন, এটি তাঁর বিরাট মেহেরবানী। এ অবস্থায় নবীর আগমনকে যারা নিজেদের জন্য রহমতের পরিবর্তে ধ্বংস মনে করে তারা অজ্ঞ ও মুর্থ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

যারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ হয় এবং আখিরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা পূর্ববর্তী সূরার শেষ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এরপর কাফেরদেরকে প্রদত্ত ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করার তাগিদ করা হয়েছে। কেননা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ বা শশ্বর্য আখিরাতের স্মরণ থেকে গাফলতের কারণ হয়। এ কারণেই এ সূরার শুরুতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে করে যারা গাফলতের মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা গাফলত পরিহার করে আখিরাতের চিন্তা করে, চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং আর্বিয়ায়ে কেরামের হেদায়েতের উপর আমল করে জীবন-সাধনাকে সার্থক করে।

সূরার ফজিলত

'আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাহ বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, ত্বাহা এবং 'আম্বিয়া' প্রথমে অবতীর্ণ অতি উত্তম সূরা। এগুলো আমার পুরনো রক্ষিত সম্পদ। [সহীহ বুখারী ৪৭০৮]

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

৭৬. আর স্মরণ করুন নূহকে; পূর্বে তিনি যখন ডেকেছিলেন তখন আমরা সাড়া দিয়েছিলাম তার ডাকে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

আদম 'আলাইহিস সালাম যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর দ্বন্দ্ব ছিল না। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শিকের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূহ আলাইহিস সালামের আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালাত ও শরীআতের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল নূহ আলাইহিস সালাম ও তার নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ বছরের সুদীর্ঘ আয়ুষ্কাল, তার নবীসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আদম 'আলাইহিস সালাম ও নূহ আলাইহিস সালামের মাঝখানে দশ 'করণ' বা প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে। [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২/৫৪৬]

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স হয়েছিল নয়শ পঞ্চাশ বছর। [সূরা আল-আনকাবুতঃ ১৪] কেউ কেউ বলেনঃ তিনি এক হাজার বছরই আয়ু পেয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়শ' পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পূর্বে আর পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পরে। উপরোক্ত আয়াতেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং শিকের লিপ্ত ছিল। তাদের শিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট কথা এই যে, তারাই যমীনের বৃকে সর্বপ্রথম শিক করেছিল। হাদীসে এসেছে যে, তাদের সম্প্রদায়ের পাঁচজন মহাব্যক্তিত্ব যাদের নাম যথাক্রমে- উদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর; তারা অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন। হঠাৎ করেই তারা মারা যান।

এতে করে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের শোকে মুহাম্মান হয়ে পড়ে। তখন শয়তান এসে তাদেরকে বলেঃ আমি কি তোমাদেরকে তাদের কিছু ছবি বানিয়ে দেব না, যাতে তোমরা তাদেরকে দেখে দেখে বেশী ইবাদাত

করতে পার? তারা অনুমতি দিলে শয়তান কিছু ছবি বানিয়ে তাদের ইবাদাতখানার পিছনে টাঙিয়ে রাখে। পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে ইবাদাতখানার সম্মুখভাগে নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে মূর্তির আকৃতি দান করে। তখনো তাদের ইবাদাত শুরু হয়নি। এ প্রজন্ম মারা যাওয়ার পরে পরবর্তী প্রজন্ম কি উদ্দেশ্যে এ মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল তা ভুলে গেলে শয়তান তাদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোর ইবাদাত করত এবং এগুলোর উসিলায় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। শেষপর্যন্ত তারা এগুলোর ইবাদাত শুরু করে। [বুখারীঃ ৪৯২০] আর এখান থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নূহে তার বিস্তারিত আলোচনা করে কিভাবে নূহ আলাইহিস সালাম তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেনঃ “হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।” এখানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। তারপর শির্ক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর ঐ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ আখেরাতের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং দুনিয়ার প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। তার সম্প্রদায়ের ১৫ বা নেতা গোছের লোকেরা উত্তরে বললঃ আমরা মনে করি যে, তুমি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছ। কারণ, তুমি আমাদেরকে বাপ-দাদার দ্বীন পরিত্যাগ করতে বলছ। কেয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ আর কিছু নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মস্ফূটন কথাবার্তার জবাবে নূহ আলাইহিস সালাম নবীসুলভ ভাষায় যা বলেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়াত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বলেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক দ্বীনের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে রাসূল। আমি যা কিছু বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌছাই। এতে তোমাদের মঙ্গল। এতে না আল্লাহর কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এরপর তারা যেহেতু নূহ আলাইহিস সালামকে তাদের মত মানুষ হওয়ার কারণে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছিল, সেহেতু তিনি তার জবাবে বলেনঃ তোমরা কি এর ফলে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার বাণী তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও এবং রহমত লাভে ধন্য হও? অর্থাৎ তার ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর যাতে করে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয়।

স্বজাতির মর্মস্ফূটন কথাবার্তার জবাবে নূহ আলাইহিস সালামের দয়াদ্র্ণ এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবেই মিথ্যারোপ করে যেতে থাকল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। আল্লাহ বলেনঃ এর পরিণতিতে আমরা নূহ ও তার সঙ্গীদেরকে নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ।

আলোচ্য আয়াতে নূহের আঃ দো'আর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুদীর্ঘকাল নিজের জাতির সংশোধনের অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবার পর শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি যে দো'আ করেছিলেন। “হে রব! আমি হেরে গেছি আমাকে

সাহায্য করো।” [সূরা আল কামারঃ ১০] এবং “হে আমার রব! পৃথিবী পৃষ্ঠে একজন কাফেরকেও ছেড়ে দিয়ো না।” [সূরা নূহঃ ২৬]

আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনা কবুল করলেন। তিনি তাকে ও তার মু'মিন অনুসারীদেরকে পরিত্রাণ দেন। এবং তার পরিবার পরিজনকেও রক্ষা করেন। শুধু তাদেরকে নয় যাদের নাম ধ্বংস প্রাপ্তদের তালিকা ভুক্ত ছিল। তার উপর ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (আঃ) তাঁর কওমের জুলুম ও অবিচার হতে মুক্তি দেন। সাড়ে নয়শত বছর তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে তাবলীগ করতে থাকেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই শিরক ও কুফরীর উপরই রয়ে যায়। এমন কি তারা তাকে কষ্ট দিতে থাকে। এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে একে অপরকে উত্তেজিত করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি হযরত নূহকে (আঃ) সাহায্য করেছিলাম ঐ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল এবং তাকে তাদের উৎপীড়ন হতে রক্ষা করেছিলাম এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠে একজন কাফিরও পরিত্রাণ পায় নাই। সবকেই ডুবিয়ে দেয়া হয়।

كَرِبَ الْعَظِيمِ (মহা সংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَآغَرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

৭৭. এবং আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে মিথ্যারোপ করেছিল; নিশ্চয় তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এজন্য আমরা তাদের সবাইকেই নিমজ্জিত করেছিলাম।

নূহ আঃ এর সম্প্রদায় আল্লাহর আয়াত অস্বীকার শুধু করি সাথে সাথে নূহ আঃ-কে পাগল বলেছিল- কুরআনে উল্লেখ আছে- নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল- সুতরাং তারা আমাদের বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল আর বলেছিল, ‘পাগল’ , আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (সূরাঃ আল-কামার আয়াতঃ ৯)

অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ আলাইহিস সালাম-কে হুমকি প্রদর্শন করে বললঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব। (সূরা শু'আরা: ১১৬)

আবদ ইবনে হুমাইদ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুশ হয়ে যেতেন এরপর হুশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহ তা ‘আলার কাছে দু ‘আ করতেন- (أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) আমি তো পরাজিত, অতএব, তুমি আমাকে সাহায্য কর। তিনি জাতির জন্য আল্লাহ তা ‘আলার কাছে ক্ষমাও চাইতেন। এভাবে সাড়ে নয়শত বছর সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জবাব দেয়ার মাধ্যমে অবশেষে তিনি নিরুপায় হয়ে বদদু ‘আ করেন। যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

وَذَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

৭৮. আর স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাতে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেঘ; আর আমরা তাদের বিচার পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

মুফাস্সিরগণ ঘটনার বিবরণ এভাবে দিয়েছেন যে, দুই লোক দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগলপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগলপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবী করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবতঃ বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগলপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) দাউদ আলাইহিস সালাম রায় দিলেন যে, ছাগলপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পন করুক। (কেননা, ফিকহ এর পরিভাষায় ‘যাওয়াতুল কিয়াম’ অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেয়া হয়। ছাগলপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেয়া হয়েছে।)

বাদী ও বিবাদী উভয়ই দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তার পুত্র) সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিye দেয়। সুলাইমান বলেনঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়পক্ষের জন্য উপকারী হত। তারপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে এ কথা জানান। দাউদ আলাইহিস সালাম বলেনঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেনঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত্রে ছাগলপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্রে ছাগলপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে তখন শস্যক্ষেত্রে উহার মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। দাউদ আলাইহিস সালাম এই রায় পছন্দ করে বললেনঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয়পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

فَقَفَّهْمَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

৭৯. অতঃপর আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমরা পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, তারা তার সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত, আর আমরাই ছিলাম এ সবার কর্তা।

এ আয়াত থেকে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারের এ মূলনীতি জানা যায় যে, দু'জন বিচারপতি যদি একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করে এবং দু'জনের ফায়সালা বিভিন্ন হয়, তাহলে যদিও একজনের ফায়সালাই সঠিক হবে তবুও দু'জনেই ন্যায়বিচারক বিবেচিত হবেন। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে বিচার করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাদের কেউ যেন অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা সহকারে বিচারকের আসনে বসে না যান। [দেখুন, কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে একথা আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যদি বিচারক নিজের সামর্থ অনুযায়ী ফায়সালা করার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালান, তাহলে সঠিক ফায়সালা করার ক্ষেত্রে তিনি দুটি প্রতিদান পাবেন এবং ভুল ফায়সালা করলে পাবেন একটি প্রতিদান।” [বুখারীঃ ৬৯১৯, মুসলিমঃ ১৭১৬]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “বিচারক তিন প্রকারের। এদের একজন জান্নাতী এবং দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতের অধিকারী হচ্ছেন এমন বিচারক যিনি সত্য চিহ্নিত করতে

পারলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য চিহ্নিত করার পরও সত্য বিরোধী ফায়সালা দেয় সে জাহান্নামী। আর অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই লোকদের মোকদ্দমার ফায়সালা করতে বসে যায় সেও জাহান্নামী।” [আবু দাউদঃ ২৫৭৩, তিরমিযীঃ ১৩২২, ইবনে মাজাহঃ ২৩১৫]

আয়াতে مع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দাউদ আলাইহিস সালামের সাথে পাহাড় ও পাখীদেরকে অনুগত করা হয়েছিল এবং সে কারণে তারাও দাউদের সাথে আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতো। একথাটিই কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ “আমরা তার সাথে পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলাম। সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। আর সমবেত পাখিদেরকেও (অনুগত করা হয়েছিল)। তারা প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিমুখী।” [সূরা সাদঃ ১৮, ১৯] অন্য সূরায় আরও অতিরিক্ত বলা হয়েছেঃ “পাহাড়গুলোকে আমরা হুকুম দিয়েছিলাম যে, তার সাথে সাথে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করো এবং এই একই হুকুম পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম।” [সূরা সাবাঃ ১০]

এ বক্তব্যগুলো থেকে যে কথা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, দাউদ যখন আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা গীতি গাইতেন তখন তার উচ্চতর ও সুরেলা আওয়াজে পাহাড় ও পাখিরা গেয়ে ফেলত এবং একটা অপূর্ব মূর্ছনার সৃষ্টি হতো। তিনি যখন যাবুর পাঠ করতেন, তখন পক্ষীকুল শূন্যে তার সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। [ইবন কাসীর] সমুদ্র কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জেযা। মু'জেযার জন্য পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যেও বিশেষ চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু মূসা আশা আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন।

একবার আবু মূসা আশা'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তার কণ্ঠ ছিল অসাধারণ সুরেলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনেকক্ষণ শুনতে থাকলেন। তার পড়া শেষ হলে তিনি বললেনঃ “এ ব্যক্তি দাউদের সুরেলা কণ্ঠের একটা অংশ পেয়েছে।” [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৯] আবু মূসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তিলাওয়াত শুনেছেন, তখন আরয করলেনঃ আপনি শুনছেন - একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। [ইবনে হিব্বানঃ ৭১৯৭, অনুরূপ মুসলিমঃ ৭৯৩] এ থেকে জানা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ কাম্য ও পছন্দনীয়।

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

৮০. আর আমরা তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; কাজেই তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে?

এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হেফযতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছেঃ “আমরা দাউদের জন্যে লোহা নরম করে দিয়েছিলাম।” [সূরা সাবাঃ ১০] আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ আলাইহিস সালামকে শেখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেয়া হয়েছে যে, “যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে (সুতীক্ষ তরবারির আঘাত থেকে) হেফযত করে।” এই প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ

থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

সুতরাং এটা ছিল এমনই নিয়ামত যার কারণে মানুষের উচিত মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাই তিনি বলেনঃ তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না?"

وَلَسَلَيَّمَانُ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

৮১. আর সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আমরা প্রভূত কল্যাণ রেখেছি; আর প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমরাই সম্যক জ্ঞানী।

এ সম্পর্কে অন্যত্র আরো বিস্তারিত আলোচনা এসেছে, বলা হয়েছেঃ “আর সুলাইমানের জন্য আমরা বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত।” [সূরা সাবাঃ ১২] অন্যত্র আরও বলা হয়েছেঃ “কাজেই আমি তার জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যা তার হুকুম সহজে চলাচল করতো যেদিকে সে যেতে চাইতো।” [সূরা সা’দঃ ৩৬] এ থেকে জানা যায় বাতাসকে সুলাইমানের হুকুমের এভাবে অনুগত করে দেয়া হয়েছিল যে, তার রাজ্যের এক মাস দূরত্বের পথ পর্যন্ত যে কোন স্থানে তিনি সহজে সফর করতে পারতেন। যাওয়ার সময়ও সব সময় তার ইচ্ছা অনুযায়ী অনুকূল বাতাস পেতেন আবার ফেরার সময়ও।

আল্লাহ তাআলা যেমন দাউদ আলাইহিস সালাম এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তার আওয়াজের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। তিনি বায়ুতে তার কাঠের বিছানা পাততেন। তারপর তাতে রাষ্ট্রের যত প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন ঘোড়া, উট, তাবু, সৈন্য-সামন্ত সবাই উঠানো হত। তারপর বাতাসকে বলা হত তা বহন করার জন্য। বাতাস তার নিচে ঢুকে তা বহন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত। তখন তাদের উপরে পাখি ছায়া দিত, এভাবে তিনি যেখানে চাইতেন সেখানে নিয়ে যেত। যখন তিনি নামতেন তখন তার সাথে তার রাজকীয় সামগ্রী সবই থাকত।

যেখানে বরকত বা প্রভূত কল্যাণ রেখেছি বলে শাম দেশ তথা সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিন এলাকাকেই বোঝানো হয়েছে। যার আলোচনা আগেই চলে গেছে।

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

৮২. আর শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এ ছাড়া অন্য কাজও করত; আর আমরা তাদের রক্ষাকারী ছিলাম।

অর্থাৎ আমরা সুলাইমানের জন্যে শয়তানের মধ্যে এমন কিছুসংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মনিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “তারা সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্যে বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড়

পেয়ালা তৈরী করত।” [সূরা সাবাঃ ১৩] সুলাইমান তাদেরকে অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করতেন। অন্য আয়াতে এসেছে, “আর (অধীন করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তান (জিন) দেরকেও, এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে।” সূরা ছোয়াদ: ৩৭-৩৮]

ফুটনোট

- নূহ আঃ এর জাতি কথা উল্লেখ করে এখানে বলা হয়েছে- তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অন্য আয়াতে (সূরা আরাফে) তাদেরকে বলা হয়েছে- অন্ধ সম্প্রদায়।
- আল্লাহ তাআলাকে একনিষ্ঠভাবে আহ্বান করলে আল্লাহ তা ‘আলা আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন। যেমনিভাবে আল্লাহ নূহ আঃ এর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।
- অপরাধ করলে অবশ্যই তার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।
- নাবীদের অবাধ্যতা, আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি ভয়াবহ।
- দাউদ ও সুলাইমান (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ তা ‘আলার অনুগ্রহের কথা আলোচ্য আয়াতগুলোতে উল্লেখ রয়েছে।

- দুইজনকে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছেন।
- আর পর্বত ও পাখিদেরকে দাউদের আঃ অনুগত করে দিয়েছিলেন,
- দাউদ আঃ কে আরো দিয়েছেন বর্ম নির্মাণ শিক্ষা।
- সুলাইমান আঃ এর বশীভূত করে দিয়েছিলেন প্রবল বায়ুকে; সেটা তার আদেশে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হত যেখানে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছি।
- শয়তানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সুলাইমানের আঃ জন্য ডুবুরীর কাজ করত,

* বিচারক কোন বিষয়ে ফায়সালা করতে গিয়ে সঠিকতায় পৌঁছার জন্য ইজতিহাদ করার পরেও ভুল করলে একটি নেকী পাবেন।

* জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে ছেলে বাপের চেয়েও বড় হতে পারে।

* দাউদ (আঃ) সর্বপ্রথম পৃথিবীতে বর্ম তৈরি করেন।

* সুলাইমান আঃ এর পিতা ছিলেন দাউদ আঃ।

* বর্ম সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত থেকে হেফাযত করে। এর প্রয়োজন থেকে দ্বীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তা‘আলা নেয়ামত আখ্যা দিয়েছেন।

* সকল ধরনের নিয়ামতের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

* যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত।

* নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।